Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করবো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া ইসলাম

রোলঃ ২১৫০০৪৮৪

২ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করবো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাদিয়া ইসলাম

রোলঃ ২১৫০০৪৮৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করবো" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাদিয়া ইসলাম, আইডিঃ ২১৫০০৪৮৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে যেভাবে আমরা রক্ষা করবো" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং

সাদিয়া ইসলাম

আইডিঃ ২১৫০০৪৮৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
১. ভুমিকা	৫
২. সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত	৬
৩. পিতা-মাতার কাছে সন্তানের কিছু হক পাওনা	৭
৪. শিশুদের প্রতি কোমল হওয়া	১১
৫. রাগের সময় প্রহার না করা -	১৩
৬. শিশুর ত্রুটি ছোট থেকেই সংশোধন করা -	১৪
৭. শিশুকে সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহ শিখানো (আচার-আচরণ, পোশাক, চলা-ফেরা)	১৭
৮. নিয়মিত কুরআন ও ইসলামি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা	২৩
৯. মা হবেন আসল দায়িত্ববান	২৪
১০. পিতা মাতার কাজের বা আমলের প্রভাব সন্তানের উপর পরে	২৫
১১. গর্ভবতী মায়ের কাজের প্রভাব গর্ভজাত সন্তানের উপর পরে	২৫
১২. কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা না বলা	২৬
১৩. শিশুর মনে আল্লাহুর ভয় জাগ্রত করা (তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া)	২৬
১৪. শিশুকে সু-শিক্ষায় বা দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা	২৮
১৫. শিশুকে মা-বাবার যথেষ্ট সময় দেয়া	২৯
১৬. পারিবারিক তালিমের ব্যবস্থা করা	৩০
১৭. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যে কোন ধরনের ডিভাইস/ইন্টারনেট থেকে সন্তানকে দূরে রাখা	৩০
১৮. শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া	৩১
১৯. শিশুকে ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া	৩২
২০. সর্ব বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা বা বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া	৩৪
২১. কিভাবে আমার সন্তান আমার আখেরাতের পুজি হবে?	৩৫
২২. পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নসিহাত	৩৭

১. ভুমিকা

সন্তান বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অন্যতম সেরা উপহার। তিনি যাকে খুশি তাকে এই উপহার দেন। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নেয়ামতের। ইরশাদ হয়েছে,

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (সুরা শুরা: ৪৯-৫০)

পবিত্র কোরআনে সন্তানকে মানবজীবনের সৌন্দর্য বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

‘সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।’ (সুরা কাহাফ: ৪৬)

আল্লাহতায়ালা মানবশিশুকে নিষ্পাপ এবং ভবিষ্যৎ সফলতার যাবতীয় উপকরণ সন্নিহিত করে দুনিয়ায় পাঠান। সৃষ্টিগত কোনো যোগ্যতা শিশু তার মায়ের পেট থেকে নিয়ে আসে না। বরং পৃথিবী নামক এ বিশাল গর্ভে দৃষ্টি মেলার পর তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মা-বাবা, সমাজ-সংসার ও শিক্ষালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ নির্ণয় করে দেয়। নিষ্পাপ শিশুকে ইসলাম যেমন স্নেহ-মমতা দিয়ে গড়ার আদেশ করেছে, তদ্রূপ ভবিষ্যতে সুন্দর নাগরিক ও পরকালীন উপযুক্ত পাথেয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকে শৃঙ্খলা ও আন্তরিক শাসনের মধ্যে আটকে রাখারও নির্দেশ করেছে।

আজকাল যুবকদের মধ্যে ধর্মহীনতার বড় কারণ এই যে, পিতা-মাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে হয়তো সেভাবে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানদের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই-ই না। আমাদের উচিত আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে নিজের ও সন্তানদের জন্য ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জানা থাকা উচিত, আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের মূল ঠিকানা ও আসল গন্তব্য পরকাল। সুতরাং পার্থিব চাহিদা, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অভিলাষ এবং তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে আমরা যেন আমাদের পরিচয় ভুলে না যাই। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যিক কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার পরিচয় গেঁথে দেয়া। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা। কারণ সন্তান হয়ত প্রত্যাশামত দুনিয়ার সব কিছুই পেল। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সব উপকরণই অর্জন করল। কিন্তু সে আল্লাহকে পেল না, পরকাল চিনল না, মনে রাখতে হবে সে কিছুই পেল না।

বর্তমানে শিশু-কিশোররা আধুনিকতার স্রোতে যেভাবে ভেসে আছে, ভবিষ্যতে এটা এক ভয়াবহ দিক নিবে। তাই পিতামাতা ও পরিবারের দায়িত্ব হবে পরবর্তী প্রজন্মকে আধুনিকতার ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে সন্তানকে ছোটো থেকেই ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

রেফারেন্স: https://dhakamail.com/religion/47535

২. সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তানের সুশিক্ষা ও যথাযথ প্রতিপালনের অভাবে অনেক পরিবারকে বিপন্ন হতে দেখা যায়। আল্লাহর নির্দেশ ভুলে খেয়ালখুশিমতো গড়ে তোলার কারণেই এমনটি হয়। কোরআনে এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলা হয়েছে,

‘নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফেতনাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।’ (সুরা তাগাবুন: ১৫)

উত্তম শিক্ষা ও উপদেশ দান হলো সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম। এটি সন্তানের জন্য মা-বাবার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম উপহার। মহানবী (স.) বলেন, 'সন্তানকে দেওয়া পিতার সর্বোত্তম উপহার হলো শিষ্টাচার।' (তিরমিজি: ১৯৫২)

সুসন্তান শুধু পার্থিব জীবনের সম্পদ নয়, পরকালীন জীবনেও তার কারণে মা-বাবা বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন,

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা সমুন্নত করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।' (মুসনাদ আহমদ: ১০৬১০)

তাই সন্তানকে খেয়াল খুশিমতো বড় করলে হবে না। তাদের শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে হবে। কারণ সন্তান শুধু উপহার নয়, একইসঙ্গে আল্লাহর আমানতও। পরকালে আল্লাহ তাআলা মা-বাবাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে।' (সুরা আনফাল: ২৮)

৩. পিতা-মাতার কাছে সন্তানের কিছু হক পাওনা

আমাদের সমাজ ব্যবস্থা দিন দিন যেভাবে অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা এবং চরিত্র বিধ্বংসী কাজের দিকে ধাবিত হচ্ছে, সেখানে আমাদের সন্তানের উপর যেসব দায়িত্ব আছে তা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পন্থায় সন্তানকে লালন-পালন করা ঈমানের অন্যতম দাবী। পিতা মাতার উপর সন্তানদের যে হক গুলো রয়েছে,

- **কানে আযান দেয়া:** সন্তান দুনিয়াতে আসার পর তার ডান কানে আযান দেয়া, তা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক।

- ❖ **সুন্দর নাম রাখা:** বাচ্চার জন্য সুন্দর নাম নির্বাচন করা পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। নাম অর্থবহ হওয়া নামের সৌন্দর্য।

- ❖ **আক্বিকা করা:** ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বিষয় হলো সন্তানের আকীকা করা। ছেলের পক্ষ থেকে ২টি ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে ১টি ছাগল আল্লাহর নামে যবেহ করা।

- ❖ **সদকাহ করা:** ছেলে হোক বা মেয়ে হোক সপ্তম দিবসে চুল কাটা এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ করা সুন্নাত।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান রা. এর পক্ষ থেকে ১টি বকরী আকীকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা! তার মাথা মুণ্ডন কর এবং চুল পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ কর।" [সুনান আত-তিরমিযী: ১৫১৯] এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "শিশুদেরকে খেজুর দিয়ে তাহনীক এবং বরকতের জন্য দো 'আ করতেন।" [সহীহ বুখারী: ৩৯০৯; মুসলিম: ২১৪৬]

- ❖ **খাতনা করা:** ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। হাদীসে এসেছে: "জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমার সপ্তম দিবসে আকীকা এবং খাতনা করিয়েছেন।" [আল-মু 'জামুল আওসাত: ৬৭০৮]

- ❖ **তাওহীদ শিক্ষা দেয়া:** শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর তাওহীদ শিক্ষা দতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন:

"হে বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখাতে চাই। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, আল্লাহও তোমার হেফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর অধিকারের হেফাযত করবে, তুমি তাঁকে সর্বদা সামনে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর যখন সহযোগিতা চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে। আর জেনে রাখ! যদি পুরো জাতি তোমার কোন উপকার করার জন্য একতাবদ্ধ হয়,

তবে তোমার কোন উপকার করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি পুরো জাতি যদি তোমার কোন ক্ষতি করার জন্য একতাবদ্ধ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে সমর্থ হবে না, শুধু ততটুকুই করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলমের লিখা শেষ হয়েছে এবং কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে।" [তিরমিযী: ২৫১৬]

- **কুরআন শিক্ষা দান:** ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দাও। তন্মধ্যে রয়েছে তাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা ও কুরআনের জ্ঞান দাও।" [জামিউল কাবীর]

- **সলাত শিক্ষা দেয়া ও সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করা:** এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যে পিতা-মাতা তার সন্তানকে সলাত শিক্ষা দিবেন এবং সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন। হাদীসে এসেছে: "আমর ইবনে শূয়াইব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বাবা তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

তোমরা তোমাদের সন্তানদের সলাতের নির্দেশ দাও সাত বছর বয়সে। আর দশ বছর বয়সে সলাতের জন্য মৃদু প্রহার কর এবং শোয়ার স্থানে ভিন্নতা আনো।" [সুনান আবূ দাউদ: ৪৯৫]

- **পাপকাজ, অশ্লিলতা, বেহায়াপনা, অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা:** সন্তান দুনিয়ার আসার সাথে সাথে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুপে, পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে, বিভিন্ন ফ্যাশনে, বিভিন্ন ডিজাইনে, বিভিন্ন শিক্ষার নামে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তাই পিতা-মাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন,

“হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।” [সূরা তাগাবুন-১৪]

হাদীসে এসেছে, ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: “রাসূলে করীম রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষকে অভিসম্পাত করেছেন।” [সহীহ বুখারী:৫৮৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।” [সুনান আবূ দাউদ:৪০৩১]

- **আদর স্নেহ ও ভালবাসা দেয়া:** সন্তানদেরকে স্নেহ করা এবং তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে।আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: “তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চুম্বন দিলেন এবং আদর করলেন। সে সময় আকরা ইবনে হাবিস রাদিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন,

আমারতো দশটি সন্তান কিন্তু আমিতো কখনো আমার সন্তানদেরকে আদর স্নেহ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে অন্যের প্রতি রহম করে না আল্লাহও তার প্রতি রহম করেন না।” [সহীহ বুখারী: ৫৯৯৭]

- **প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করা:** সন্তানদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত লালন-পালন করতে হবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করতে হবে। “উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আবূ সালামার সন্তানদের জন্য

আমি যদি খরচ করি এতে কি আমার জন্য প্রতিদান রয়েছে? নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

হ্যাঁ যতদিন তুমি খরচ করবে ততদিন তোমার জন্য প্রতিদান থাকবে।" [সহীহ বুখারী: ৫৩৬৯]

- **বিবাহ দেয়া:** সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়া এবং বিবাহর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহর ব্যবস্থা করা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে: "নিশ্চয়ই পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেবে।" [জামিউল কাবীর]
- **দো'আ করা:** আমাদের সন্তানদের জন্য দো 'আ করতে হবে। আল্লাহ তা 'আলা আমাদেরকে দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে,

আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা বলে:

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।"

[সূরা আলফুরকান-৭৪]

রেফারেন্স:

https://quraneralo.net/rightes-of-children/

৪. শিশুদের প্রতি কোমল হওয়া

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে শিশুরা সব ধরনের দায়ভার ও জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত। তারা শারীরিকভাবে যেমন দুর্বল তেমনি মানসিকভাবেও কোমল। তাই তাদের সঙ্গে কোমল ও নরম আচরণ করতে হয়। তাদেরকে শিক্ষাদান করতে হয় স্নেহ-মমতা দিয়ে। এক্ষেত্রে ধমক, কঠোরতা ও প্রহার পরিহার করে নম্রতা ও কোমলতার পথ অবলম্বন করতে হয়। যে নম্রতা ও কোমলতার আচরণ করতেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ

শিক্ষক হজরত রাসূলে কারিম (সা.)। এ প্রসঙ্গে হাদিসে আছে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসের শেষে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

আল্লাহতায়ালা আমাকে হঠকারী ও কঠোরতাকারীরূপে প্রেরণ করেননি; বরং সহজ-কোমল আচরণকারী শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন।

আমরা যদি আমাদের ছোটদের সঙ্গে ভালো ও কোমল ব্যবহার করি, তাহলে বড়রাও আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন। নবীজির শিক্ষা হলো,

কোমলতা অবলম্বন করো। কঠোরতা পরিহার করো। (মুসলিম, হাদিস: ১৭৩২)

বাস্তবেও কোমলতায় যে ফায়দা হয়, কঠোরতার দ্বারা তা হয় না। সুন্দর করে বুঝিয়ে বললে ছোটরা সব কথাই শোনে। আর ধমক দিয়ে কিছু বললে তারা আরো বেঁকে বসে। তাই আমাদের উচিৎ হবে ছোটোদের সাথে কোমল ব্যাবহার করা।

আল্লাহ তাআলা কোমলতা পছন্দ করেন: শিশুদের ভুলত্রুটি মধুর শাসনে সংশোধন করতে হয়। তাদের শিক্ষাদানে শিশুতোষ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। পাঠদানে চিন্তাশীল ও সতর্ক হতে হয়। তাদের মনোযোগিতা তৈরিতে কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

কখনো ও মাত্রাতিরিক্ত ভয়ভীতি দেখানো কিংবা অযথা প্রহার করা সঙ্গত নয়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে রাসুল (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা কোমল আচরণকারী, তিনি সর্বক্ষেত্রে কোমলতাকে ভালোবাসেন।' (বুখারি, হাদিস: ৬০২৪)

ভয়-ভীতি দেখানো অনুচিত: আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা সাহাবিদের থেকে বর্ণনা করেন– তারা রাসুল (সা.) সঙ্গে কোনো সফরে ছিলেন। তখন তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়লে অন্য কেউ তার তীরটি নিয়ে নেয়। পরে লোকটি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ভয় পেয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে সবাই হেসে ওঠেন। তখন রাসুল (সা.) বললেন, 'তোমরা হাসলে কেন?' তারা বলল, এমনিতেই। তবে আমি তার তীরটি নিয়েছিলাম। আর এতেই সে ঘাবড়ে গেছে। রাসুল (সা.) তখন বললেন,

কোনো মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে ভয় দেখানো বৈধ নয়। (আবু দাউদ, হাদিস: ৫০০৪; আহমদ, হাদিস: ২২৫৫৫)

রেফারেন্স:

https://www.dhakapost.com/religion/16277

৫. রাগের সময় প্রহার না করা

হজরত থানভি (রহ.) বলেন, 'রাগান্বিত অবস্থায় কখনো শিশুকে প্রহার করবে না। শাস্তির প্রয়োজন হলে রাগ প্রশমিত হওয়ার পর চিন্তাভাবনা করে শাস্তি দেবে। মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলতেন, অন্যান্য গুনাহ তো তাওবার মাধ্যমে মাফ হতে পারে। কিন্তু শিশুদের ওপর জুলুম করা হলে এর ক্ষমা পাওয়া খুবই জটিল। কেননা এটা বান্দার হক। আর বান্দার হক শুধু তাওবার দ্বারা মাফ হয় না। আগে যার হক নষ্ট করা হয়েছে, তার কাছে মাফ চাইতে হয়। শিশুর কাছ থেকে মাফ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ নাবালেগের ক্ষমা শরিয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি শিশু যদি মুখে বলেও যে আমি মাফ করলাম, তবু তা গ্রহণযোগ্য নয়।হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, হজরত রাসূলে কারিম (সা.) ইরশাদ করেছেন,

তোমরা শিক্ষাদান করো, সহজ ও কোমল আচরণ করো; কঠোর আচরণ করো না। যখন তুমি রাগান্বিত হবে তখন চুপ থাক। যখন তুমি রাগান্বিত হবে তখন চুপ থাক। যখন তুমি রাগান্বিত হবে তখন চুপ থাক (এ কথা তিনবার বললেন) । -মুসনাদে আহমদ

শিশুদেরকে বা অন্য কাউকে প্রহার করা সম্পর্কে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

৬. শিশুর ত্রুটি ছোট থেকেই সংশোধন করা

শিশুদের ছোট ছোট ত্রুটি, অহংবোধ, অন্যকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা শৈশবেই সংশোধন করা উচিত। কাউকে গালি দিলে কিংবা কোনো আঘাত করলে সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে মাফ চাইয়ে নেওয়াতে হবে। যাতে সে অন্যায়টা বুঝতে পারে এবং তার ভেতরে মাফ চাওয়ার গুণ তৈরি হয়।

- ❖ **মেরেধরে সন্তানের ভুল সংশোধনের চেষ্টা না করা:** বাচ্চাদের ছোট-বড় নানা ভুলের জন্য অনেক সময়ই ধৈর্য্য হারিয়ে অভিভাবকরা তাদের ওপর হাত তোলেন। বাচ্চাদের ফের একই ভুল করা থেকে আটকানোর জন্য মারধর করলেও পরবর্তীকালে এটি বাচ্চাদের মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলে থাক।

১. ভুল করার পর মা-বাবার মারের হাত থেকে বাঁচতে বাচ্চারা মিথ্যে কথা বলতে শুরু করে। ক্রমশই মিথ্যে কথা বলা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়।

২. অনেক সময় সন্তান কথা না শুনলে তাদের মেরেধরে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন অনেক অভিভাবক। অভিভাবকদের এই পন্থাকেই তারা সঠিক মনে করতে শুরু করে। স্বভাবতই নিজের বন্ধুদের সঙ্গে কথায় কথায় মারপিটে জড়িয়ে পড়ে তারা।

৩. অভিভাবকের স্বভাবের প্রতিফলন ঘটে সন্তানের মধ্যে। মা ও বাবাকে দেখেই বাচ্চারা অনেক কিছু শেখে। ছোট-খাটো বিষয় বাচ্চাদের বকাবকি বা মারধর করলে সেটাকেই তারা ভুল সংশোধনের সঠিক পদ্ধতি মনে করে। পরবর্তী কালে যে কারও ভুল শুধরানোর জন্য তারা এই পদ্ধতিই গ্রহণ করে।

৪. মারধরের কারণে যে শুধু শারীরিক পীড়া হয় তা-ই নয়, বরং মানসিক দিক দিয়েও তারা আঘাত প্রাপ্ত হয়। তাদের মনে ভয় বাসা বাঁধে। এর ফলে তারা সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতে শুরু করে। আবার অধিক হিংসার শিকার বাচ্চাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনকি কঠিন পরিস্থিতি কী ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, তাও বুঝে উঠতে পারে না তারা। এ ভাবেই ধীরে ধীরে অবসাদের কবলে পড়ে বাচ্চারা।

৫. কিছু কিছু অভিভাবক কথায় কথায় বাচ্চাদের দোষ-ত্রুটি বার করেন। তারা ভালো কিছু করার চেষ্টা করলেও, তার মধ্যে খুঁত ধরেন। অনেক অভিভাবকই নিজের বাচ্চার সঙ্গে তাদের বন্ধুর তুলনা করে থাকেন। এর ফলে নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে শুরু করে তারা। নিজেকে অন্যের তুলনায় দুর্বল ও গুড ফর নাথিং মনে করতে থাকে।

৬. সবসময় মারধর করলে তাদের আত্মবিশ্বাসও আহত হয়। নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ক্রমশই একাকীত্বে ভুগতে শুরু করে।

৭. অধিক মারধর করলে হীতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। মার খাওয়ার ভয় চলে গেলে, ভুল সংশোধনের পরিবর্তে তারা একই ভুল বার বার করতে থাকে।

৮. বাচ্চা সব সময় মার খেলে মা-বাবার প্রতি তাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলে তারা মা-বাবা থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। আবার বাচ্চাদের মনে রাগ জমলে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য অভিভাবক বা অন্যদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। অনেক সময় রাগ পুষে রাখে এবং ভবিষ্যতে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে।

৯. মার খাওয়া গা-সওয়া হয়ে গেলে এক সময়ের পর বাচ্চারা ঢিট ও জেদি হয়ে পড়ে। কিশোর অবস্থায় পৌঁছতে পৌঁছতে তারা সম্পূর্ণ রূপে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তখন ভালোবেসে বা আদর করে কিছু বললেও মা-বাবার কথা কানে তুলবে না তারা।

১০. যে কোনও ভুলের জন্য শুধু মার খেলে, বাচ্চারা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন মা-বাবার বকাবকি বা মারধরকে গায়ে মাখে না তারা।

- **মারধর না-করে বাচ্চাদের অনুশাসনে রাখার বিকল্প পথ:** মনে রাখবেন, জন্মের সময় বাচ্চাদের মধ্যে দুর্ব্যবহারের প্রবণতা থাকে না। আশপাশ থেকে দেখে বা তারা যেমন ব্যবহার পায়, তার ভিত্তিতে নিজের স্বভাব ও আচরণ গড়ে তুলতে শুরু করে। বাচ্চা দুষ্টুমি বা ভুল করলে মারধর, চেঁচামেচি না-করে অন্য উপায় তাদের সংশোধনের চেষ্টা করুন।

এর জন্য সবার আগে নিজেরা শান্ত হন, ধৈর্য্য ধরুন। বাচ্চারা কোনও ভুল করলে নিজের রাগ তাদের ওপর বার করবেন না। যে মুহূর্তে বুঝতে পারবেন, বাচ্চার ওপর হাত উঠে যেতে পারে, এক পা পিছিয়ে আসুন, জল খান। নিজেকে সময় দিন, মাথা ঠান্ডা করুন। আপনি সে সময় নানা চাপের মধ্যে থাকতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সন্তানের ভুলের জন্য নিজের সমস্ত রাগ তাদের ওপর বার করে দেবেন। পরিবর্তে তাদের কথা শুনুন। হতেই পারে যে, আপনার অনুমতি না পাওয়ার আশঙ্কায় তারা কিছু না বুঝেই ভুল পদক্ষেপ করে ফেলেছে। চেঁচানো বা মারধরের আগে তাদের কথা শুনুন।

সন্তানকে নিজের বন্ধু বানান। মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক এমন হোক, যাতে সন্তান নির্দ্বিধায় নিজের মনের কথা মা-বাবাকে খুলে বলতে পারে। এর ফলে বাচ্চাদের মনে চলতে থাকা নানা বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকবেন। পাশাপাশি সন্তানের ভুল-ঠিক দুই চিন্তাভাবনার প্রতিও সচেতন থাকবেন। এর ফলে সন্তানের ভুল সংশোধনের সময় ও সুযোগ পাবেন। সন্তানের বয়স কম বা বেশি– যা-ই হোক না কেন আদতে পরিবারেরই লাভ হবে এতে।

অনেক সময় ভুল স্বীকার করে নেওয়ার পরও বাচ্চাদের কপালে মার জোটে। এই অভ্যাস এক্ষুনি ত্যাগ করুন। কারণ এর ফলে তারা সত্যি কথা বলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। ভুল স্বীকার করে মার খাওয়ার পরিবর্তে মিথ্যে কথা বলে মারের হাত থেকে বাঁচতে চাইবে। তাই মারধরের পরিবর্তে ধৈর্য্য ধরে বাচ্চাদের বোঝানোর চেষ্টা করুন।

রেফারেন্স:

https://eisamay.com/lifestyle/section-for-kids/10-negative-effects-of-beating-children/articleshow/82214818.cms

বাচ্চারা ভুল স্বীকার করলে, তাদের মারবেন না। ভুল শুধরে নিতে এবং ভবিষ্যতে একই ভুল না-করতে বলুন। ফলে তাদের মিথ্যে বলার প্রবণতা যেমন কমবে, তেমনই সত্যি কথা বলার অভ্যাস বজায় থাকবে।

৮. শিশুকে সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহ শিখানো (আচার-আচরণ, পোশাক, চলা-ফেরা)

মানুষের সঙ্গে নবীজির আচার-ব্যবহার: মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। সসীম এই জীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করে অসীম জীবনের সফলতা অর্জন করার জন্য। এ জন্য তিনি যুগে যুগে বহু নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন, যাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) । মহান আল্লাহ তাঁকে আমাদের অনুকরণীয় ব্যক্তি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে রাসুল (সা.)-এর আচরণ কেমন ছিল, তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

পরিবারের সঙ্গে নবীজি (সা.)-এর আচরণ: মহানবী (সা.) তাঁর স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সব স্ত্রীর খোঁজ নিতেন এবং তাঁদের সময় দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে,

‘ফজরের নামাজের পর নবী করিম (সা.) নামাজের স্থানে বসে থাকতেন।

সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত লোকেরাও তাঁর চারপাশে বসে থাকত। অতঃপর তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে যেতেন, তাঁদের সালাম দিতেন, তাঁদের জন্য দোয়া করতেন আর যাঁর দিন থাকত তাঁর কাছে গিয়ে বসতেন।’ (তিবরানি, হাদিস: ৮৭৬৪)

এমনকি তিনি স্ত্রীদের সংসারিক কাজে সহযোগিতাও করতেন। আয়েশা (রা.) বলেন,

‘নবী করিম (সা.) জুতা ঠিক করতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং তোমরা যেমন ঘরে কাজ করো তেমনি কাজ করতেন।’ (মুসনাদে আহমদ, হাদিস: ২৫৩৮০)

সাহাবাদের সঙ্গে নবীজি (সা.)-এর আচরণ: সাহাবায়ে কেরামের প্রতি রাসুল (সা.) অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তাঁর নম্র আচরণে মুগ্ধ হয়েই অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দুই জাহানের বাদশা হয়েও তিনি এতটাই সাধাসিধে জীবন যাপন করতেন, যে কেউ খুব সহজে তাঁর কাছে যেতে পারত। তিনি সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসুলুল্লাহ (সা.) জিকির অত্যধিক পরিমাণে করতেন এবং অনর্থক কাজ একেবারেই করতেন না; আর নামাজ দীর্ঘ করতেন ও খুতবা সংক্ষেপ করতেন। তিনি বিধবা ও গরিবদের সঙ্গে চলাফেরায় সংকোচবোধ করতেন না; যাতে তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। (নাসায়ি, হাদিস: ১৪১৪)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে কোনো দিন আমাকে বাধা প্রদান করেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, মুচকি হাসি দিয়েছেন। (বুখারি, হাদিস: ৩৮২২)

নেতা হিসেবে রাসুল (সা.): পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা ছিলেন রাসুল (সা.) । তাঁর উপমা তিনি নিজেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা হয়েও তিনি তাঁর সঙ্গীদের ছোটখাটো কাজেও আত্মনিয়োগ করতে সংকোচ করতেন না। বারাআ (রা.) বলেন,

নবীজি (সা.) খন্দক যুদ্ধের দিন মাটি বহন করেছিলেন। এমনকি মাটি তাঁর পেট ঢেকে ফেলেছিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তাঁর পেট ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। (বুখারি, হাদিস: ৪১০৪)

আবার মুসলিমসমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে তিনি কখনো কখনো কঠোরও হয়েছেন। মুসলিম বাজারে মানসম্মত খাবার বিক্রয় হচ্ছে কি না তা নজরদারি করতে তিনি নিজেই বাজারে গিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) খাদ্যশস্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি স্তূপের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, ফলে হাতের আঙুলগুলো ভিজে গেল। তিনি বলেন, হে স্তূপের মালিক, এ কী ব্যাপার? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এতে বৃষ্টির পানি লেগেছে। তিনি বলেন,

সেগুলো তুমি স্তূপের ওপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিতে পারত। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে, আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। (মুসলিম, হাদিস: ১৮৫)

অমুসলিমের সঙ্গে নবীজির আচরণ: প্রিয় নবী (সা.) এতটাই উদার ছিলেন যে তিনি কখনো অহেতুক কোনো অমুসলিমের সঙ্গেও রূঢ় আচরণ করেননি এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ ব্যাপারে সচেতন করেছেন। আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.)-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব কি না?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনে উয়াইনাহ (রহ.) বলেন,

এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেন, 'দ্বিনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে, আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি।' (বুখারি, হাদিস: ৫৯৭৮)

সেবকের সঙ্গে নবীজি (সা.)-এর আচরণ: মানুষ সাধারণত নুন থেকে চুন খসলেই

রেফারেন্স:

https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2021/03/04/1010563

সেবক ও অধীনস্থদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, গায়ে হাত তুলে বসে। কিন্তু রাসুল (সা.) কখনো এমন করেননি। আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো কোনো সেবককে এবং কোনো নারীকে মারধর করেননি। (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৭৮৬) অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, আনাস (রা.) বলেন, আমি ১০ বছর নবী (সা.)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমার প্রতি উঃ! শব্দটি করেননি। এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি এ কাজ কেন করলে এবং কেন করলে না? (বুখারি, হাদিস: ৬০৩৮

পোশাক পরিধানে ইসলামের নীতিমালা: সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই ভালো আচার-আচরণ ও শিষ্টাচারগুলি শেখানো উচিত। কারণ সু–আচার–আচরণগুলি পরবর্তীতে বাচ্চাদের জন্যই উপকারি হয়ে ওঠে। এতে করে শিশুদের আত্নসম্মান বৃদ্ধির পাশাপাশি

সামাজিকতা ও ভদ্র, বিনয়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এবং এ ক্ষেত্রে সব সময় সুন্নাহকে গুরুত্ব দেয়া।

বাস্তব কারণেই মহানবী (সা.) শিক্ষা অর্জন ও জ্ঞানচর্চার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাণ্ডার আল-কোরআনের ধারক-বাহক। অজ্ঞতার এক চরম পর্যায়ে, অশান্তির এক অগ্নিঝরা দিনে, জালিমের দোর্দণ্ড প্রতাপে মজলুম মানবতার মুক্তি যখন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল, ঠিক সে সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে শিক্ষার আলোকিত মশাল নিয়ে এসেছিলেন মহানবী (সা.)। তাঁর এ জ্ঞানের মশাল জ্বলে উঠেছিল শত দীপশিখায়, ছড়িয়ে পড়েছিল দিগদিগন্তে। তাঁর আবির্ভাবে এবং কোরআনের চির নির্ভুল সত্যবাণী অবতীর্ণ হওয়ার ফলে অজ্ঞতার গাঢ় অন্ধকার কেটে গেল।

পোশাকের শিষ্টাচার লঙ্ঘনের কারণে মানুষের ওপর জান্নাত হারাম হওয়ার ঘোষণাও এসেছে, তাই প্রতিটি মুমিনেরই পোশাকের শিষ্টাচারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া আবশ্যক। নিম্নে পোশাকের কিছু শিষ্টাচার তুলে ধরা হলো–

ডান দিক থেকে পরিধান করা: প্রতিটি উত্তম কাজই ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নত। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা যখন পোশাক বা জুতা পরিধান করো এবং অজু করো, তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪১৪১)

দোয়া পড়া: পোশাক পরিধানের সময় নবীজির শেখানো দোয়াটি পড়লে গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো কাপড় পরার সময় এ দোয়া পাঠ করবে তার আগে ও পরের সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে; উচ্চারণ– 'আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি কাসানি হা-জাস সাওবা ওয়া রজাকনিহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নি ওয়ালা কুওয়াতিন।'

অর্থ– 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার কৌশল ও ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়াই আমাকে এ কাপড়ের ব্যবস্থা করে পরালেন। (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০২৩)

সাদা পোশাককে প্রাধান্য দেওয়া: সামুরাহ বিন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন,

'তোমরা সাদা রঙের পোশাক পরিধান করো। কেননা তা অধিক পবিত্র ও উত্তম। (ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৩৫৬৭)

তবে নবীজি (সা.) মাঝেমধ্যে ভিন্ন রঙের পোশাকও পরিধান করেছেন। (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৬৫)

সামর্থ্যমতো উত্তম পোশাক পরিধান করা: পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে?' (সুরা আরাফ, আয়াত: ৩২)

হাদিস এসেছে, আবুল আহওয়াস (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কম মূল্যের পোশাক পরে নবী (সা.)-এর কাছে এলে তিনি বলেন, তোমার ধন-সম্পদ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, যেহেতু আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করেছেন, কাজেই আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মাঝে প্রকাশিত হওয়া উচিত।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৬৩)

জুমা ও বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষ পোশাক: বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ মেহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং জুমার দিনের জন্য ভালো পোশাক আলাদা রাখাও নবীজি (সা.)-এর সুন্নত। আমাদের নবীজি (সা.) কোনো প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এবং জুমার দিনে ভালো পোশাক পরতেন।

আসমা (রা.)-এর মুক্তদাস আবদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত, আসমা (রা.) আমার সামনে একটি তায়ালিসি জুব্বা বের করলেন। তাতে এক বিঘৎ পরিমাণ এক টুকরা রেশমি কাপড় লাগানো ছিল, যা দ্বারা জুব্বার দুটি কিনারা মোড়ানো ছিল। তিনি বলেন, এটা রাসুল (সা.)-এর জুব্বা। তিনি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এবং জুমার দিন তা পরতেন। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস: ৩৪৯)

পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা: পরিছন্নতা মুমিনের ভূষণ, তাই নবীজি (সা.) অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা রাসুল (সা.) আমাদের এখানে এসে এক বিক্ষিপ্ত চুলওয়ালাকে দেখে বলেন, লোকটি কি তার চুলগুলো আঁচড়ানোর জন্য কিছু পায় না? তিনি ময়লা কাপড় পরিহিত অপর ব্যক্তিকে দেখে বলেন, লোকটি কি তার কাপড় ধোয়ার জন্য কিছু পায় না? (আবু দাউদ, হাদিস: ৪০৬২)

ঢিলেঢালা পোশাক পরা: ইসলামে এমন পোশাক পরা নিন্দনীয়, যা পরার পরও মানুষের দেহাবয়ব ফুটে ওঠে। ইসলামে আঁটসাঁট পোশাক পরা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জাহান্নামবাসী দুই প্রকার মানুষ, আমি যাদের (এ পর্যন্ত) দেখিনি। একদল মানুষ, যাদের সঙ্গে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তা দ্বারা তারা লোকজনকে মারবে এবং একদল স্ত্রী লোক, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না, এমনকি তার সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত এত দূর হতে তার সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।' (মুসলিম, হাদিস : ৫৪৭৫)

সতর পরিপূর্ণ ঢাকা হয়, এমন পোশাক পরা: পোশাক যাতে এমন না হয়, যা পরিধান করার পরও মানুষের সতর অন্যের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়। কারণ সতর প্রকাশ করা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক গুনাহ। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। (মুসলিম, হাদিস: ৬৬৫)

বিপরীত লিঙ্গের পোশাক না পরা: ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং যেসব পুরুষ নারীদের বেশ ধারণ করে তাদের রাসুল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন। (তিরমিজি, হাদিস: ২৭৮৪)

পুরুষদের রেশমি কাপড় পরা থেকে বিরত থাকা: আবু মুসা আল-আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে পুরুষদের জন্য রেশমি পোশাক এবং স্বর্ণালংকার ব্যবহার হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে।' (তিরমিজি, হাদিস: ১৭২০)

পুরুষদের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় পরা: পুরুষদের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় পরাও জঘন্য অপরাধ। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইজারের (লুঙ্গির) বা পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের গোড়ালির নিচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে। (বুখারি, হাদিস: ৫৭৮৭)

ছবিযুক্ত পোশাক পরা থেকে বিরত থাকা: আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙে ছাড়তেন না, যার মধ্যে কোনো (প্রাণীর) ছবি থাকত।(বুখারি, হাদিস: ৫৯৫২)

রেফারেন্স: https://www.kalerkantho.com/online/islamic-life/2022/08/18/1173929

৮. নিয়মিত কুরআন ও ইসলামি বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা

শিশুদের নিয়মিত কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র গ্রন্থ কুরআন নাজিল করছেন যে, তাঁর বান্দাগণ নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করবে; কুরআনের অর্থ ও ভাব অনুধাবন করবে এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করবে। কুরআনে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই কুরআন থেকে ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়াবলীর সঠিক দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

বাস্তবিকপক্ষেই কুরআন তেলাওয়াত এমনই একটি আমল, যা ব্যক্তিকে কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপন এবং পরকালমুখী করে দেয়। দুনিয়ার জীবনের সফলতার পথ দেখায় এবং মহান আল্লাহর বিধিবিধান খুব ভালোভাবে বুঝার সুযোগ করে দেয়।

কুরআনের পাশাপাশি শিশুদের বিভিন্ন ইসলামি বই পড়তে দিতে হবে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার যুগে অনেকেই বই পড়ার অভ্যাস ভুলতে শুরু করেছে। কিন্তু শিশুর মেধা বিকাশ থেকে শুরু করে ব্যক্তিত্ব গঠন, সবকিছুতেই ভূমিকা রাখতে পারে বই পড়ার অভ্যাস। তাই শিশুকে বিভিন্ন ধরনের ইসলামি বই পড়া শেখান। এই অভ্যাস শিশুর শব্দভাণ্ডার, ভাষার দক্ষতা, একাগ্রতা এবং কল্পনার বিকাশে সহায়তা করে। বিভিন্ন ধরনের বই পড়লে শিশুর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে এবং সে সহজেই অন্যদের অনুভূতি বুঝতে শিখবে। শিশুকে তাই ইসলামি বই পড়তে দিন।

৯. মা হবেন আসল দায়িত্ববান

পৃথিবীতে সন্তানের সবচেয়ে নিকটতম মানুষ মা। সন্তানের জন্য মায়ের যে মমতা ও ব্যাকুলতা তার কোনো তুলনা নেই।সন্তানের লালন-পালন ও উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মায়ের কোল প্রতিটি সন্তানের প্রথম পাঠশালা। মায়ের কাছেই সন্তান গ্রহণ করে জীবনের প্রথম পাঠ। মায়ের ভাষাতেই ফোটে সন্তানের প্রথম কথা। মায়ের আচরণ থেকেই সে শিখে জীবন যাপনের নিয়ম। শৈশব-কৈশোরে সন্তানের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে, সেটাই তার জীবনের শেকড় ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এরপর যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন কৈশোরে গড়া সেই ভিত্তিই তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই সন্তানের উষালগ্ন হতে যদি তাকে সঠিক তরবিয়ত দেয়া না হয়, উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দায় গড়ে তোলা না হয়, তাহলে পরে আর কোনো পন্থাই কার্যকর হয় না।

শিশুর মনমানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, বোধ-বিশ্বাস, রুচি-শিক্ষা, স্বভাব-সভ্যতা, ভদ্রতা তথা ভালো গুণগুলো একজন মা-ই সহজে তাঁর সন্তানের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা যত মহান ব্যক্তিকে দেখতে পাই, তাঁদের সফলতার পেছনে দেখা যায়, মায়ের অবদান বেশি। মা হলেন সন্তানের জন্য প্রথম পাঠশালার প্রথম শিক্ষক। তাই মাকে হতে হবে সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সজাগ ও দায়িত্ববান।

যে বাচ্চা মায়ের কাছে ইলম-আদবের ছবক পায়, সে বড়ই ভাগ্যবান। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে সে শৈশবের সেই আদবের অনুশীলন তীব্রভাবে অনুভব করে নিজের মধ্যে। ছোটবেলায় যারা মা শিক্ষকের শিক্ষা লাভ করতে পারেননি, তারা নিজের প্রতি লক্ষ্য করুন! আত্মিক পশুত্বকে দূর করতে নিজের সাথে কতটা কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে! সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধের পরিবার গড়তে সৎকর্ম পরায়ণ মায়ের বড়ই প্রয়োজন রয়েছে।

১০. পিতা মাতার কাজের বা আমলের প্রভাব সন্তানের উপর পরে

মা-বাবার সব কাজের প্রভাব পড়ে সন্তানের ওপর। সন্তান যদি বাবাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে আদায় করতে দেখে, তাহলে সন্তানও মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করবে। তেমনিভাবে সন্তান যদি মাকে জায়নামাজে

রেফারেন্স:

https://www.daily-bangladesh.com/religion/267537

দেখে, তাহলে অবুঝ বয়সেও সে মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়বে, সেজদা দেবে। মূলত সন্তান শিশুকাল থেকে মা-বাবাকে যেমন দেখবে, নিজের জীবনকে তেমনভাবেই সাজাবে।

১১. গর্ভবতী মায়ের কাজের প্রভাব গর্ভজাত সন্তানের উপর পরে

গর্ভকালীন মায়ের সব কর্মের প্রভাব পড়ে সন্তানের ওপর। মায়ের একটু সচেতনতা দ্বারা সন্তান সুস্থ, সুদর্শন, বুদ্ধিমান, নেককার ও দ্বিনদার হতে পারে। আবার সামান্য একটু অসচেতনতা দ্বারা সন্তান অসুস্থ, ত্রুটিপূর্ণ, দুর্বল, নির্বোধ ও বেদ্বিন হতে পারে। তাই এ অবস্থায় মাকে বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজও পড়তে হবে। ঠিকমতো খাবারদাবার খেতে হবে। রাত্রি জাগরণ বর্জন করতে হবে। সব সময়

হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করতে হবে। সুযোগ পেলেই কোরআন তিলাওয়াত করতে হবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, হাফেজা ও কোরআন তিলাওয়াতকারী মায়ের সন্তান অতিমাত্রায় মেধাবী হয়। একজন নিষ্ঠাবান 'মা' দ্বারা একটি নিষ্ঠাবান জাতিরও জন্ম হয়।

১২.কান্না থামানোর জন্য মিথ্যা না বলা

শিশুর কান্না থামানোর জন্য বা তার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় করার জন্য মিথ্যা বলা জায়েজ নয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণনা, একবার আমার আম্মা কিছু একটা দেবেন বলে আমাকে কাছে ডাকলেন। নবীজি (সা.) তখন আমাদের বাড়িতে বসা ছিলেন। তিনি আমার আম্মাকে বললেন, তুমি কি সত্যিই তাকে কিছু দেবে? আম্মা বললেন, হ্যাঁ! তাকে খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।

নবীজি বললেন, যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে তবে তোমার এ কথাটি মিথ্যা বলে গণ্য হতো। (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৯১)

১৩. শিশুর মনে আল্লাহুর ভয় জাগ্রত করা (তাওহিদের শিক্ষা দেওয়া)

শিশুর কচি অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত করে দিতে হবে। মা-বাবা যদি শিশুকে শাসনের ভয় দেখিয়ে বা অন্যরা খারাপ বলবে এই ভয় দেখিয়ে মন্দ অভ্যাস থেকে নিবৃত্ত করতে চান, তবে এটা হবে সাময়িক। মা-বাবা বা অন্য সবার অগোচরে, যেখানে শাসন কিংবা লোকলজ্জার ভয় থাকবে না, সেখানে শিশু দ্বিতীয়বার এ ধরনের কাজে উৎসাহী হতে পারে।

কিন্তু যদি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে এটা পাপ। এমন করলে আল্লাহ নারাজ হবেন। আল্লাহ সব সময় সবাইকে দেখছেন। কোনো কিছুই তার দৃষ্টির আড়ালে নয়। এবং তার অন্তরেও আল্লাহর ভয় বসে যায়, তাহলে শিশুর সব বদ-অভ্যাস স্থায়ীভাবে ঠিক হয়ে যাবে।

❖ **তাওহিদের শিক্ষা:** গবেষণায় দেখা গেছে- 'শিশুরা প্রথম বছরগুলোতেই পূর্বপুরুষদের অধিকাংশ চিন্তা-চেতনার আলোকে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। এবং প্রায় নব্বই শতাংশ শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রম শিশুর প্রথম বছরগুলোতেই সম্পন্ন হয়।' সুতরাং মায়ের কাছে থাকাকালীন সময়টা যথাযথভাবে কাজে লাগানো বেশি গুরুত্বপর্ণ।

তাই সন্তানকে তাওহিদ বা একত্ববাদের শিক্ষা দেওয়া সবচেয়ে জরুরি। পাশাপাশি তাকে মহৎ বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া জরুরি। বিশেষত প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই উত্তম কথা ও কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া চাই।

❖ **জিকিরে অভ্যস্ততা:** শিশুর সামনে জিকিরের বেশ প্রভাব রয়েছে। তাই প্রথম থেকেই বিভিন্ন দোয়া-দরুদ পড়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে এ জিকিরসমূহ উচ্চারণে অভ্যস্ত করানো একান্ত জরুরি–

১.উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

২.সুবহানাল্লাহ;

অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র

৩.আলহামদুলিল্লাহ;

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

৪.আল্লাহু আকবার;

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৫.লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ;

অর্থ: আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো ক্ষমতা নেই এবং কোনো শক্তি নেই; ইত্যাদি।

- ❖ **গুরুত্বপূর্ণ দোয়া:** ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে উঠা; খাবার খাওয়ার ও খাবার শেষের দোয়া; ঘর থেকে বের হওয়া এবং বাইরে থেকে ফেরার দোয়া; শৌচকার্যে যাওয়ার ও সেখান থেকে বের হওয়ার পর দোয়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত করানো চাই।

- ❖ **সাত বছর বয়সে নতুন ধাপ:** ওই বয়সে শরিয়ত নির্ধারিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া। রাসুল (সা.) বলেন,

'তোমাদের সন্তানদের তোমরা নামাজের নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হয় এবং যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন নামাজ না পড়ার কারণে তাদের প্রহার করো। আর তাদের শোয়ার স্থান পৃথক করে দাও।' (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৯৪)

রেফারেন্স: https://www.dhakapost.com/religion/5724

১৪. শিশুকে সু-শিক্ষায় বা দিনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা

বর্তমান যুগে অনেক মা-বাবা জানেন না সন্তানকে কী বিষয় শিক্ষা দেবেন। এ অবস্থায় নিজেদেরও প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে তাওহিদ, রেসালাত, ঈমান, কুফর সম্পর্কে জানা জরুরি। এরপর সন্তানকে আদব-আখলাক এবং দীনি শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে খাঁটি মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সন্তানদেরকে আলেমদের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়াও প্রয়োজন। কেননা তাঁদের ব্যক্তিত্ব, উপদেশ ও দোয়া সন্তানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তা হতে পারে তার জন্য অমূল্য সম্পদ। তাই মাতা-পিতার প্রধান দায়িত্ব হলো স্বীয় সন্তানকে দ্বিনি শিক্ষা দান করা। মহানবী (সা.) বলেছেন,

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর দ্বিনি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। (ইবন মাজাহ, বায়হাকি, মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪)

আল্লামা আবু হেলাল আসকারি বলেন,

শিশুর জ্ঞান-বুদ্ধি হলে প্রথমে তার কাছে আল্লাহর পরিচয় দিতে হবে। তারপর অলংকার শাস্ত্র ও কোরআন শিক্ষা দিতে হবে। কোরআনের মাধ্যমে সে রাসুলকে চিনবে এবং রাসুলের মাধ্যমে আল্লাহকে চিনবে (কিতাবুস সানায়াতাইন)। পিতার অর্থ-সম্পদ ও মায়ের তত্ত্বাবধান উভয়ের মাধ্যমেই সন্তান হতে পারে সুশিক্ষিত ও আদর্শবান। ইমাম রাবিয়াতুর রায়ের মাতা স্বামীর রেখে যাওয়া ৮০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে স্বীয় পুত্রকে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হজরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর মাতা স্বীয় পুত্রকে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদে প্রেরণের কাহিনি সর্বজনবিদিত।

১৫. শিশুকে মা-বাবার যথেষ্ট সময় দেয়া

সন্তানকে সুন্দর আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব মা-বাবার ওপর। কিন্তু তারা আজকাল অফিস-আদালতের কাজকর্মে এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে সন্তানকে সময়ই দিতে পারেন না। সকালে সন্তানকে ঘুমে রেখে অফিসে যান। আবার বাসায় এসে ঘুমে পান। ছুটির দিন না হলে সাধারণত দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব বাসার কাজের বুয়াদের ওপর ছেড়ে দেন। ফলে সে সারা দিন যার কাছে থাকছে, তার আচার-আচরণ শিখছে। শিক্ষিত বহুগুণের অধিকারী মা-বাবার অনেক কিছুই সন্তান শিখতে পারছে না।

রেফারেন্স: https://www.daily-bangladesh.com/religion/267537

১৬. পারিবারিক তালিমের ব্যবস্থা করা

তালিমী বৈঠক দ্বীন চর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম। এটি হতে পারে কোন মাহফিল-জালসা বা দ্বীন শিক্ষার কোন প্রশিক্ষণ সমাবেশ অথবা ঘরোয়া পরিবেশে পারিবারিক বৈঠক কিংবা মহিলা সমাবেশ। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে হলেও সবগুলোই মূলতঃ দ্বীন শিক্ষার আসর।

পরিবারের সবাই মিলে একসাথে বসে কেউ একজন কোন একটি বই থেকে সকলের উদ্দেশ্যে পড়ুন। ফজরের পর হলে ভালো হয়। প্রথম প্রথম কেউ বসতে না চাইলে একাই চালিয়ে যান। একেবারে নিয়ম বানিয়ে নিন। পরিবারে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এটা বেশ ইফেক্টিভ।

১৭. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যে কোন ধরনের ডিভাইস/ইন্টারনেট থেকে সন্তানকে দূরে রাখা

বর্তমানে বাংলাদেশে অসংখ্য শিশু স্মার্টফোনে অতিরিক্ত সময় কাটাচ্ছে। এতে শুধু তাদের চোখের ক্ষতিই নয়, সামগ্রিক বিকাশ ব্যাহত হয়। অনেক মা-বাবা শিশুদের খাওয়ানোর সময় স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। এই সময়টা শিশুরা নিষ্ক্রিয়ভাবে স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকে।

মা-বাবা ও সন্তানেরা একসঙ্গে থাকার সময়ও প্রত্যেকেই নিজের স্মার্টফোনে ব্যস্ত—এ দৃশ্য সাধারণ হয়ে গেছে। পাশাপাশি থেকেও পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ব্যাপারটি উদ্বেগজনক।

বাচ্চাদের থেকে ফোনকে দূরে রাখার জন্য কিছু কিছু কৌশল অবলম্বন করা যায়:

- একদম ছোট বাচ্চাদের সামনে ফোন জিনিসটা দেখানো উচিত নয় এবং তাদের সামনে ফোন যতটা পারা যায় কম ব্যবহার করাই ভালো এতে তাদের ফোন সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হবে না খুব অল্প বয়স থেকে।
- বাবা মার উচিৎ বাচ্চাদের বেশি করে সময় দেয়া। তাদের সাথে থাকা। তাদের খেলার সাথী হওয়ার চেষ্টা করা।
- এখন বাজারে বিভিন্ন শিক্ষামূলক নানা রকম খেলনা কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো বাচ্চাদের কিনে দেওয়া।
- বিকালে করে অবশ্যই তাদেরকে খেলতে দিতে হবে। নিজের সাথে করে খেলতে নিয়ে যেতে হবে।

১৮. শিশুর মধ্যে উন্নত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া

জীবনের শুরুর দিকের বছরগুলো শিশুদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছোট্ট শিশুদের নানা ধরনের যে অভিজ্ঞতা এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক তা আক্ষরিক অর্থেই তাদের মস্তিষ্কের বিকাশে ভূমিকা রাখে। আর সেই প্রারম্ভিক ভিত্তি সমস্ত শিক্ষা ও আচরণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে, যে প্রভাব জীবনভর থেকে যায়। তাই জীবনের শুরুর বছরগুলোর গুরুত্ব অবজ্ঞা করার উপায় নেই।

মস্তিষ্কের বিকাশে সহায়তা করার জন্য এবং বিশেষ করে ছোট্ট শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য যেকোনো বাবা-মা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করতে পারেন তা হলো- সেই ছোট্ট শিশুকে ভালোভাবে বোঝা, তার আচরণ বা অঙ্গভঙ্গি বুঝতে সক্ষম হওয়া।

শিশুর আগ্রহ, ইচ্ছা, অনুভূতি ও স্বপ্ন— আল্লাহপ্রদত্ত। শিশুকে ভালো কিছুর প্রতি আগ্রহী দেখলে তাতে অংশ গ্রহণে সুযোগ করে দেওয়া। যেমন- পড়ার প্রতি আগ্রহী সংশ্লিষ্ট

বইপত্রের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সর্বোপরি, শিশুর আগ্রহ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে এবং মেধাশক্তি বিকাশে যথাযথ সচেষ্ট হওয়া চাই।

১৯. শিশুকে ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া

শিশুর কোনো সুন্দর আচরণ বা প্রশংসনীয় কাজ চোখে পড়লে, তার প্রশংসা করতে হবে। তাকে খুশি করার মতো কিছু পুরস্কার দিতে হবে।মানুষের সামনে করতে হবে তার প্রশংসা। এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে যখন সে কিছু করবে প্রথমবারের মতো, তখন তা উপেক্ষা করতে হবে। গোপন রাখতে হবে; অন্যের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। বিশেষত বাচ্চাটিই যখন চাইবে সেটিকে গোপন রাখতে। অন্যের কাছ থেকে আড়াল করতে। যদি দ্বিতীয়বার এ কাজের পুনরাবৃত্তি করে, তবে তাকে গোপনেই শাসাতে হবে। বলে দিতে হবে, এমন কাজ তুমি দ্বিতীয়বার করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় মানুষের সামনে তোমাকে লজ্জা দেয়া হবে।

তাকে শাসন করার সময় কখনো অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। এতে করে তার পক্ষে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার শোনা এবং মন্দ বিশেষণ হজম করা সহনীয় হয়ে উঠবে। তার অন্তরে কথার প্রভাব হ্রাস পাবে। তার হৃদয়ে কথার প্রভাব যেকোন মূল্যে বজায় রাখতে হবে। তাকে কেবল মাঝে মধ্যেই ভর্ৎসনা করা যাবে। মা তাকে বাবার ভয় দেখাবেন। মন্দ কাজ থেকে ধমকাবেন।

বাবা-মা' র কোন কিছু নিয়ে তাকে সঙ্গী-সাথী বা বন্ধু-বান্ধবের সামনে বড়াই করতে নিষেধ করবেন। তাকে বরং বিনয়, সাথীদের সম্মান এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় কোমলতার স্বভাবে গড়ে তুলবেন। তাকে শেখাবেন- ত্যাগেই সম্মান; গ্রহণে নয়। মানুষের জিনিস নেয়া নিন্দনীয়। তা এমনকি নিচুতা ও হীনতার পরিচায়ক। যদি গরিব ঘরের সন্তান হয়, তবে তাকে শেখাতে হবে পরের জিনিস নেয়া এবং পরের সম্পদে লোভ করা অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর। তাকে অভ্যস্ত করাবেন যাতে সে সবার সামনে থুথু না ফেলে।

অন্যদের উপস্থিতিতে হাই না তোলে। অন্যদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসে। কারো পায়ের ওপর নিজের পা না রাখে। থুতির নিচে হাতের তালু না রাখে এবং কাঁধে হেলান দিয়ে মাথা না রাখে। কারণ, তা অলসতার আলামত। তাকে আদব শিক্ষা দিবেন। বেশি কথা বলা থেকে বারণ করবেন। এটি যে এক ধরনের বেয়াদবী, তাও তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। কথা সত্য হোক বা মিথ্যা, তা নিয়ে তাকে মাথা ছুয়ে কসম করতে নিষেধ করবেন। যাতে শৈশব থেকেই তার এ বদ অভ্যাস গড়ে না ওঠে। শিশুকে নিষেধ করতে হবে, বড়দের সামনে কথার সূচনা না করতে। অভ্যস্ত করতে হবে যে, সে যেন বড়দের প্রশ্নের-ই শুধুমাত্র জবাব দেয়। যতটুকু জিজ্ঞেস করা হয় কেবল ততটুকু-ই বলে। তাঁরা কথা বললে মনোযোগসহ যেন শোনে।

বড় কেউ এলে তার সম্মানে উঠে জায়গা খালি করে দেয়। তাদের সামনে যেন না বসে। তাকে বিরত রাখবেন বাজে কথা ও অশ্লীল বাক্যোচ্চারণ থেকে। অন্যকে গালমন্দ করা ও অভিশাপ দেয়া থেকে। যার মুখ থেকে সবসময় গালি উচ্চারিত হয়, তার সঙ্গ ত্যাগ করতে বলবেন। কারণ, খারাপ সঙ্গীদের থেকে তার মাঝে যেন বাদ অভ্যাস ঢুকতে না পারে। বাচ্চাদের শিষ্ট-ভদ্র বানানোর প্রধান উপায়ই হলো তাকে কুসঙ্গ থেকে দূরে রাখা।

বলাবাহুল্য, পরিচর্যা যা করার প্রতিটি জিনিসের প্রাথমিক পর্যায়েই তা করতে হয়। শিশুকে মূলত ভালো-মন্দ উভয় চরিত্রের মিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার পিতা-মাতাই তাকে ভালো-মন্দের যে কোনটির দিকে ধাবিত করেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘প্রতিটি শিশু (ইসলাম) ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় অথবা অগ্নিপূজক বানায়। (বুখারী :১২৯২; ইবন হিব্বান :১২৯; বাইহাকী :১১৯১৮)

অতএব আল্লাহর এ আমানত সম্পর্কে আমাদের সজাগ ও আরও বেশি দায়িত্ববান হতে হবে। সন্তানদের বাহ্যিক প্রয়োজন পূরণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক খোরাকের প্রতিও নজর রাখতে হবে। আল্লাহ তা ‘আলা আমাদের সবাইকে তার নির্দেশ মতো সন্তান মানুষ করার তাওফীক দান করুন।

রেফারেন্স:

https://patheo24.com/%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87/

২০. সর্ব বিষয়ে ইসলামী শিক্ষা বা বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া

সকল সৃষ্টির মধ্যে বিশেষভাবে মানুষকেই আল্লাহ তাআলা জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা দান করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষ যেমন তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের উত্তম পন্থা আবিষ্কার করতে পারে তেমনি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সফলতা-ব্যর্থতার জ্ঞানও ধারণ করতে পারে। দুনিয়ার নিযাম ও ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার জন্য যেমন জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন তেমনি দ্বীনের হিফাযতের জন্য এবং দুনিয়ার সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক হওয়ার জন্য দ্বীনী শিক্ষার প্রয়োজন।

মুসলিম সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ যেন দ্বীন মোতাবেক চলতে পারে এবং হারাম থেকে বেঁচে হালালভাবে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য কুরআন-সুন্নাহয় পারদর্শী একটি জামাআত বিদ্যমান থাকা অপরিহার্য। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

কেন বের হয় না প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল, যাতে তারা দ্বীনের তাফাক্কুহ অর্জন করে এবং ভীতি প্রদর্শন করে তাদের জাতিকে যখন তারা ফিরে আসে তাদের নিকট। সম্ভবত তারা আল্লাহ ভীতি অর্জন করবে।’ [সূরা তাওবা: ১২২]

এজন্য প্রত্যেক জনপদে দ্বীনের ইলমে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকা ফরযে কিফায়া। আর এই উদ্দেশ্যে দ্বীনের ইলমের চর্চা অব্যাহত রাখা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য।

ইসলামে দ্বীনী শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি জাগতিক শিক্ষারও গুরত্ব রয়েছে। পার্থিব প্রয়োজন পূরণ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য জাগতিক শিক্ষা অতীব জরুরি। উপরন্তু বহু দ্বীনী কাজের জন্যও জাগতিক শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে।

পক্ষান্তরে জীবনের সকল কাজ ইসলামের বিধান মোতাবেক করার জন্য দ্বীনী শিক্ষার বিকল্প নেই। দ্বীনী ইলমের চর্চা ও বিকাশের মাধ্যমেই সমাজে ঈমান-আমল, আল্লাহ ভীতি ও আখিরাত-মুখিতা সৃষ্টি হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া যেমন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আখিরাতের কামিয়াবী অর্জন করা যায় না তেমনি দুনিয়ার জীবনও দুর্নীতি, অনাচার, জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্ত করা যায় না। এজন্য আখিরাতে কামিয়াবী ও দুনিয়ায় শান্তি নিরাপত্তার জন্য দ্বীনী ইলমের চর্চা অপরিহার্য।

২১. কিভাবে আমার সন্তান আমার আখেরাতের পুজি হবে?

সুসন্তান বাবা-মার জন্য দুনিয়াত ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। আর কুসন্তান বাবা-মার জন্য অভিশাপ। কারণ কুসন্তানের জন্য বাবা-মা দুনিয়াতে অপমানিত হওয়ার পাশাপাশি হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।

সুসন্তানকে ইসলামের পরিভাষায় নেককার সন্তান বলা হয়। নেককার সন্তান এই দুনিয়ার জন্য বরকতময় আবার পরকালেরও সঞ্চয়পত্র। মানুষ মৃত্যুর পর আমলের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আমল দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় করে যাওয়ার কারণে তার সাওয়ার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। হজরত আবু হুরাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না। এক, সদকায়ে জারিয়া, দুই, ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তিন, নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। [সহিহ মুসলিম: ১৬৩১, সুনামে আবু দাউদ: ২৮৮০]

ছোট থেকেই শেখাতে হবে বিনয়ী আচরণ, সঙ্গী-সাথিদের সম্মান করা, কথাবার্তায় কোমলতা, ত্যাগেই সম্মান; গ্রহণে নয়। মানুষের জিনিস নেওয়া নিন্দনীয়। অন্যদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসা। কারো পায়ের ওপর নিজের পা না রাখা। বড়দের প্রশ্নের শুধু জবাব দেওয়া; যতটুকু জিজ্ঞেস করা হয় শুধু ততটুকু বলা। বড়দের কথা মনোযোগসহ শোনা। বড় কেউ এলে তার সম্মানে উঠে জায়গা খালি করে দেওয়া। কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকা। মা-বাবা, শিক্ষক, গুরুজন এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়, চেনা-অচেনা সব মুরব্বিকে মান্য করা। যখন সে ভালো-মন্দ বোঝার বয়সে উপনীত হবে, তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। রমজান মাসে যে কয়দিন পারে, রোজা রাখতে বলতে হবে।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন খুব কঠিন। মৃত্যুর পর যেখানে এই পৃথিবীর কোনো ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য কাজে আসবে না। কেউ চাইলেই নিজের ভুলগুলো সংশোধন এবং আমল বাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু, মৃত্যুর পরও তিনটি পদ্ধাতি আমল জারি থাকে। এই তিনটি আমলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেককার সন্তান।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল-কুরআনে পৃথিবীর সকল সন্তানদের তাদের বাবা-মার জন্য তিনটি দোয়া শিখিয়েছেন।

বাবা-মা জীবিত কিংবা মৃত্য যে অবস্থায় থাকুক না কেন, প্রত্যেক সন্তানের দ্বায়িত্ব হলো প্রতিদিন এ দোয়াসমূহ পাঠ করা। এ দোয়াসমূহ হলো,

১. رَّب ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا [الاسراء: ٢٤]

(রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা)

অর্থ: (হে আমাদের) পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। [সুরা বনি ইসরাইল: ২৪]

২. رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارٗا]نوح :٢٨[

(রাব্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মুমিনাও জ্বালিমিনা ইল্লা তাবারা)

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার বাবা-মাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং আপনি জালেমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না। [সুরা নূহ:২৮]

৩.]٤١ :ابراهيم[رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ

(রাব্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিলুমুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব)

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার বাবা-মাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। [সুরা ইব্রাহিম: ৪১]

এই দোয়াগুলাতে রয়েছে সন্তান-সন্ততি ও মুমিন নারী-পুরুষ সবার জন্য কল্যাণকর।

রেফারেন্স:

https://www.jugantor.com/islam-life/450206/%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B

২২. পরিশিষ্ট কিছু আলোচনা ও নসিহাত

সন্তান দুনিয়ার আসার সাথে সাথে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং বিভিন্নভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রুপে, পোশাক-পরিচ্ছেদের মাধ্যমে, বিভিন্ন ফ্যাশনে, বিভিন্ন ডিজাইনে, বিভিন্ন শিক্ষার নামে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করে। তাই পিতা-মাতাকে অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে।

আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে শৈশব থেকে সন্তানের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং তার প্রতিপালনে আন্তরিক হওয়া মা বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশেষত ১০ বছর বয়স

পর্যন্ত সন্তানের আচার-আচরণ ও অভ্যাসগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

‘যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে বলল—সে ছিল তার কল্যাণকামী।’ [সুরা: লোকমান, আয়াত: ৩১]

এই আয়াতে লোকমান (আ.)-কে সন্তানের জন্য কল্যাণকামী হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোয় কল্যাণকামী পিতা হিসেবে তাঁর উপদেশ ও প্রচেষ্টা সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

প্রত্যেক বাবা-মার উচিত আল্লাহতায়ালার নিকট নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করা। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের নেক সন্তান চাওয়ার পদ্ধতিটি আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর আল্লাহর নিকট বলেন,

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস দানকারী (সুরা আম্বিয়া: ৮৯) ।

প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জানা থাকা উচিত, আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের মূল ঠিকানা ও আসল গন্তব্য পরকাল। সুতরাং পার্থিব চাহিদা, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অভিলাষ এবং তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে আমরা যেন আমাদের পরিচয় ভুলে না যাই। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যিক কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার পরিচয় গেঁথে দেয়া। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা। কারণ সন্তান হয়ত প্রত্যাশামত দুনিয়ার সব কিছুই পেল। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সব উপকরণই অর্জন করল। কিন্তু সে আল্লাহকে পেল না, পরকাল চিনল না, মনে রাখতে হবে সে কিছুই পেল না।

যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের আখেরাত ধ্বংস করল, মুসলমান হয়েও সন্তানকে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ দিল না সেই মা-বাবা সন্তানের মৌলিক

অধিকার রক্ষা করল না, তাদের আসল দায়িত্বই পালন করল না। তারা হলেন জালিম আর সন্তান হল মাজলুম।

তাই প্রত্যেক বাবা-মার উচিত তাদের সন্তানদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং ইসলামের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা। আল্লাহতায়ালা সকল মুসলমানদের নেককার সন্তান দান করুক এবং বাবা-মাকে সন্তানের প্রতি দ্বায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুক।

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110783732/